করোনায় প্রণোদনার রাজনৈতিক অর্থনীতি

ড. এ. কে. এনামুল হক

করোনা পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। যেসব দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অত্যন্ত সবল, তাদের নাস্তানাবুদ ও অসহায়ত্ব দেখে অনেকেই ভাবছেন, আমাদের আর আশা নেই। আমার পরিচিত একজন, যিনি বিদেশী নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও দেশে এসেছিলেন দেশসেবার জন্য, তিনিও পালিয়েছেন। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কোনো আশা নেই! আমাদের মধ্যে যারা এ দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে অবিশ্বাস করে সামান্য পেটে ব্যথায়ও বিদেশে সুচিকিৎসা করতে চলে যেতেন, তারাও পড়েছেন বিপদে। এখন না আবার দেশের 'অস্বাস্থ্যকর' স্বাস্থ্যসেবায় মরে যাই! বুঝতেই পারছেন, দেশে বসবাস করে দেশীয় ব্যবস্থাকে রক্ষা করা আমাদের জন্য কতটা জরুরি। আমরা তা করিনি। বলেছি আমার জন্য বিদেশ রয়েছে! আশা করি, তাদের ভুল ভাঙবে। গত লেখায় লিখেছি, করোনা আমাদের বদলে দেবে। তবে দেশ এখন চলছে জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝিতে। আমরা ঘরে থাকব, নাকি কাজে যাব? এ প্রশ্ন এখন লাখ লাখ লোকের। না খেয়ে মরব, নাকি করোনায় মরব? না খেলে মৃত্যুর সম্ভাবনা শতভাগ আর করোনা হলে মৃত্যুহার ২-৩ শতাংশ!

এর মধ্যে ত্রাণ তৎপরতা বাড়াতে সরকারের সব মহলকে উৎসাহিত করা হয়েছে। বেসরকারি পর্যায়ে আমার জানামতে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। কতগুলো তথ্য দিয়ে শুরু করি। সরকারি হিসাব মতে, দেশে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রায় ১৩ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় দুই কোটি লোক প্রতিদিন তিনবেলা খেতে পায় না। এর অর্থ প্রায় ৪০ লাখ পরিবার নিয়মিত তিনবেলা খাবার খায় না। সামর্থ্য নেই। তার বাইরে আরো দেড় কোটি লোক বা ১৬ লাখ পরিবারও দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে। ১৯৭৪ সালে দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯২ লাখ। তখন বাংলাদেশ ছিল কৃষিনির্ভর দেশ। বন্যার কারণে ফসল নষ্ট হওয়ায় খেটে খাওয়া মানুষ কাজ না পেয়ে হারিয়েছিল আয়ের উৎস। কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে কাজের সময় প্রাকৃতিকভাবে নির্ধারিত। তাই কাজের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরবর্তী ফসল বোনার সময় পর্যন্ত। তার মধ্যে যা হওয়ার হয়েছে। ধনীদের খাবারের অভাব হয়নি। কিন্তু দরিদ্র ও মধ্যম আয়ের লোকেরা অনাহারে অর্ধাহারে কাটিয়েছিল। শিল্পাচার্য জয়নুলের ছবি আমাদের অনেক কিছুই মনে করিয়ে দেয়। সেই একই সময় আমার পরিচিত এক মার্কিন অধ্যাপক এসেছিলেন সরকারকে উপদেশ দিতে। তিনি বাস করছিলেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। তার ভাষায়, 'এক রাতে সরকারের এক সচিব আমাকে নিয়ে গেলেন রাস্তার ওপারে বিখ্যাত সাকুরা রেস্তোরাঁয়। হেঁটে গেট পার হওয়ার সময় আমি এক করুণ দৃশ্য দেখলাম কিন্তু সচিব ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকার। পায়ে ঠেলে তাদের ফেলে দিলেন। আমরা গেলাম সাকুরাতে। এখনো আমার সে দৃশ্য মনে আছে। আমি খাবার খেতে পারিনি।' বলা বাহুল্য, তিনি আমাকে সেই ঘটনাই বর্ণনা করেছিলেন ২০১২ সালে। কথাগুলো মনে করছি কারণ আমাদের ত্রাণ তৎপরতা নিয়ে আরো ভাবার বিষয় আছে।

ফিরে আসি বর্তমানে। আজকের দিনে আমরা যে দুর্গতিতে রয়েছি, তার কারণও প্রাকৃতিক। নভেল করোনাভাইরাসে মানবজাতি আক্রান্ত। এখন কিন্তু আমরা কৃষিনির্ভর অর্থনীতি নই। এখন আমাদের দেশের ৫৩ শতাংশ অর্থনীতি সেবানির্ভর। ৩৩ শতাংশ শিল্পনির্ভর আর মাত্র ১৪ শতাংশ কৃষিনির্ভর, যদিও কৃষি খাত প্রায় ৪০ শতাংশ শ্রমিকের আয়ের উৎস। আজকের অবস্থা তা-ই ভিন্ন। এখন প্রায় ৬০ শতাংশ লোকের কাজ থেমে আছে। চলছে কেবল কৃষি। কৃষকরাও পড়বেন বিপদে। কারণ পণ্য বিক্রয় করতে না পারলে তা পচে যাবে। অতি উৎসাহী সরকারি কর্মচারীরা আবারো বাজার বন্ধের তাগাদা দিচ্ছেন। আর শেষ পর্যন্ত তা যদি বাস্তবায়ন হয়, তবে গোটা অর্থনীতিই মুখ থুবড়ে পড়বে। বাজার বন্ধ করা আর সামাজিক সচেতনতার দ্বারা পণ্য সরবরাহ চালু রাখা এক কথা নয়। অচল যাতায়াত ব্যবস্থায় শিল্প উৎপাদন বন্ধ হয়েছে। সবাই সরকারের অনুগ্রহ চাইছে।

উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখা সহজ নয়। দরকার কাঁচামালের। দরকার শ্রমিকের। কিন্তু আপাতত তা সম্ভব হবে না। এ অবস্থায় সবারই দাবি প্রণোদনা প্যাকেজ। তবে প্রশ্ন হবে প্রণোদনা কেন? প্রথমত, কর্মচারীদের বেতন দেয়ার জন্য, যেহেতু আয় নেই কিন্তু বেতন দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, ভাড়া, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদির বিল দেয়ার জন্য। তৃতীয়ত, ব্যাংকের পাওনা শোধের জন্য। তাই প্রণোদনা লাগবে। সরকারের উদ্দেশ্য হবে এমনভাবে প্রণোদনা দেয়া, যাতে কারখানা বন্ধ করে মালিকরা ঘরে বসে ফেসবুকিং করতে না বসে। যেমন সরকারের প্রথম দফা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি সংগঠন কারখানা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছিল। তাহলে তাদের কেন প্রণোদনা দেবেন? আবার মাসের ১০০ শতাংশ আয় যদি কারখানায় না গিয়ে পাওয়া যায়, তবে কর্মচারীরা কেন যাবেন কারখানায়?

বিশ্বের সব সরকারই এই নিয়ে দ্বৈততার মধ্যে আছে। মার্কিন প্রণোদনার নিয়মে ঘরে বসে বেতন পাওয়া যাবে। ব্রিটিশরা বলেছে, ৮০ শতাংশ বেতন তারা দেবে। মালিকদের হাতে কোনো টাকা যাবে না। যাবে কর্মচারীদের হাতে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো প্রণোদনা দিচ্ছে কেবল ঋণের সুদের ওপর। অর্থাৎ ঋণের সুদ মওকুফ হবে আর তার টাকা যাবে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানে বা ব্যাংকে। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের জন্য তাদের প্রদেয় ভ্যাট কিংবা আয়করের ওপর ভিত্তি করে তারা প্রণোদনা দিচ্ছে। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য থোক মাসিক প্রণোদনা। অর্থাৎ প্রণোদনার অর্থ যেন মালিকদের বিনোদনে ব্যয় না হয়, তার জন্য যথেষ্ট সজাগ সব দেশ। আমাদের দেশে এমনিতেই ঋণের টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যায়। তাই প্রণোদনা দেয়ার ক্ষেত্রে সাবধান হওয়া ভালো। আমার পরিচিত এক শিল্পপতি, যিনি হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন, তার রয়েছে মালয়েশিয়া ও ব্রিটেনে প্রায় এক ডজন বাড়ি। সবই হয়েছে ঋণের টাকায়। তার ঋণের সুদ কি মওকুফ হওয়া উচিত? তিনি এখন খোদ ব্রিটেনেও প্রণোদনা পেতে সচেষ্ট।

এই যখন অবস্থা তখন সরকারের উচিত সঠিক প্রণোদনা কাঠামো ঠিক করে এগুনো। প্রথমত, সব মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে যারা কর দিচ্ছে, তাদের জন্য ব্যবস্থা হবে করের অনুপাতে। যারা কর দেয় না, তাদেরকে ধরে নেয়া হবে তারা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান। আর তাদের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুসারে প্রণোদনা দেয়া উচিত। তাতে কর প্রদানে সবাই উৎসাহী হবে। দেশের এই সময় কর বিষয়টির অবতারণা অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। তবে সরকারি যেকোনো সাহায্য করের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত। তবে এর অর্থ এই নয় যে কর বেশি দিলে প্রণোদনা বেশি পাবেন। প্রয়োজন যোগসূত্র তৈরি। আর যারা করের আওতায় পড়েন না, তাদের জন্য প্রয়োজন সাধারণ ব্যবস্থা, যাকে বলা হয় সোস্যাল সেফটি নেট বা সামাজিক রক্ষণ ব্যবস্থা। তার আওতায় ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ নেই। সবাই সমান হারে প্রণোদনা পাবে।

বলা বাহুল্য, সরকার এরই মধ্যে গরিব জনগোষ্ঠীর জন্য চাল-ডালের প্যাকেট বিতরণ শুরু করেছে। বিষয়টি অপ্রত্যাশিত নয়। তবে তার বিতরণ কৌশল নিয়েও চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। ছয় লাখ লোক বিদেশ থেকে দেশে এসেছেন। তাদের সবারই পাসপোর্ট আছে। এখন তাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এই যখন অবস্থা, তখন কী করে প্রণোদনা সাধারণের কাছে পৌঁছবে, তা নিয়ে আরো চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। বিতরণ এলাকাভিত্তিক করা প্রয়োজন। সিডর-পরবর্তী একটি সমীক্ষার কথা বলি। সমীক্ষায় দেখতে পেলাম, দূরবর্তী অঞ্চলে ত্রাণ বিতরণে কারো আগ্রহ থাকে না। ফলে নগরের কয়েক কিলোমিটারেই চলে এই কার্যক্রম। সরকারি কর্মচারী কিংবা এনজিওদের দূরবর্তী স্থানে যেতে আগ্রহ কম। তারা আসলে প্রণোদনা নয়, চায় প্রচারণা। তাই দেখবেন এসব কার্যক্রমের গভীরতা থাকে না। ব্যর্থ হয়। সিডরের অভিজ্ঞতার আলোকে বলি, বরগুনার এক দূরবর্তী গ্রামে গিয়ে জানলাম, সেখানে সিডর-পরবর্তী ত্রাণ কেবল গ্রামের মেম্বার সাহেবই এনেছিলেন। কারণ ভোট পেতে তাকে গ্রামের লোকজনের কাছেই যেতে হবে। সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক শাসকের সঙ্গে। তাই শাসককে খুশি রাখা বা তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছে দেয়াই তাদের কাজ। কোনো ক্ষেত্রে শাসক অখুশি হলে বড়জোর বদলি হবে। এর বেশি কিছু হবে না। তাদের ভাগ্য জনগণের বাহবাতে নির্ভরশীল নয়। দুঃখের বিষয়, আমরা এখনো সরকারি কর্মচারীদের অনেক বেশি বিশ্বাস করি (শাসক হিসেবে), জনপ্রতিনিধিকে নয়। ফলে জনগণের বন্ধু থেকে যায় আড়ালে। বিষয়টি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কাম্য নয়।

বরগুনার এক দূরবর্তী গ্রামে গিয়ে জানলাম, সেখানে সিডর-পরবর্তী ত্রাণ কেবল গ্রামের মেম্বার সাহেবই এনেছিলেন। কারণ ভোট পেতে তাকে গ্রামের লোকজনের কাছেই যেতে হবে। সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক শাসকের সঙ্গে। তাই শাসককে খুশি রাখা বা তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছে দেয়াই তাদের কাজ। কোনো ক্ষেত্রে শাসক অখুশি হলে বড়জোর বদলি হবে। এর বেশি কিছু হবে না। তাদের ভাগ্য জনগণের বাহবাতে নির্ভরশীল নয়। দুঃখের বিষয়, আমরা এখনো সরকারি কর্মচারীদের অনেক বেশি বিশ্বাস করি (শাসক হিসেবে), জনপ্রতিনিধিকে নয়। ফলে জনগণের বন্ধু থেকে যায় আড়ালে

বলার উদ্দেশ্য হলো, সরকারের প্রচেষ্টায় যদি স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে ত্রাণ যায়, তবে প্রতিটি গ্রামে যাবে তা নিশ্চিত। সরকারি সংস্থাগুলোর দায়িত্ব হবে শাসকের পক্ষে নজরদারি করা যেন ত্রাণ সঠিক জায়গায় পৌঁছে। অন্যথায় অনাহারী জনগণ শহরে আবির্ভূত হবে। আর তাহলে লঙ্গরখানা দ্বারাও তা সামলানো যাবে না। আমাদের ইতিহাস তা-ই বলে। গরিব সিংহভাগ জনগণের কাছে চাল-ডাল পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা যেন ব্যর্থ না হয়, তা-ই কাম্য।

ড. এ. কে. এনামুল হক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট